CHAPTER-6

জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ

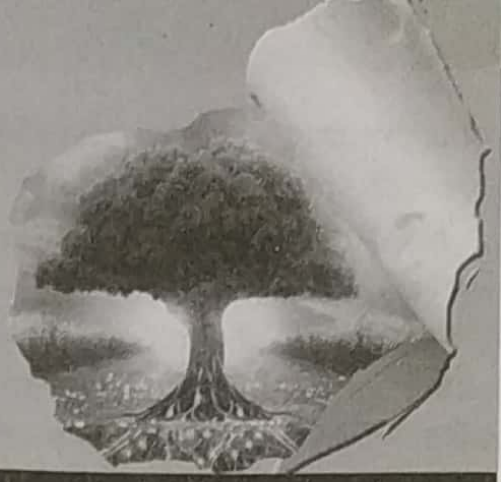

BIODIVERSITY AND ITS CONSERVATION

6.1 জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) :

একটি নির্দিষ্ট পরিবেশগত অবস্থায় এবং একটি স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সমন্বয় বা উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর উপস্থিতিকে **জীববৈচিত্র্য** (Biodiversity) বলে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী **ওয়াল্টার.জি.রোসেন** (Walter.G.Rosen) 1986 সালে জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। অনেক বিজ্ঞানী জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity শব্দটির ইংরেজি সমার্থক হিসেবে '*Biologie of Diversity*' ব্যবহার করেছেন। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী **থমাস . ই . লাভজয়** 1980 সালে প্রথম 'Biological Diversity' শব্দটি ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে 'জীববৈচিত্র্য' শব্দটি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় হয়েছিল **ই.ও.উইলসনের** দ্বারা। সর্বোচ্চ জীববৈচিত্র্যের উপস্থিতির উদাহরণস্বরূপ ক্রান্তীয় বৃষ্টিঅরণ্য বাস্তুতন্ত্রের (Tropical Rainforest Ecosystem) অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য জৈব প্রজাতি বসবাস করে। জীব প্রজাতির এই বৈচিত্র্যকে জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) বলে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 10 কোটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার, বহু প্রজাতি বিলুপ্তও হয়েছে।

6.1.1 *সংজ্ঞা (Definition) :*

(1) UNEP-এর সংজ্ঞা অনুসারে, "জীববৈচিত্র্য হল কোনো অঞ্চলের সমগ্র জিন, প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্র।" ('Biodiversity is the totality of genes, species and ecosystems in a region.'— **UNEP**)

(2) সি. জে. ব্যারো (C.J. Barrow) (2005) জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, " একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (বাস্তুতন্ত্রে) প্রতিটি প্রজাতির মধ্যবর্তী জিনগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র্য হল জীববৈচিত্র্য" ['Biodiversity is the diversity of different species together with genetic variation within each species in a given area (ecosystem)'. **C . J . Barrow** (2005)]

6.1.2 *জীববৈচিত্র্যের ভৌগোলিক বণ্টন (Geographical Distribution of Biodiversity) :*

পৃথিবীর সর্বত্র প্রজাতির বা জীববৈচিত্র্যের বণ্টনের মধ্যে সমতা নেই। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পর্যন্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের উপস্থিতি দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের যে অসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায় তার কারণগুলি হল— ভূমিরূপ, জলবায়ু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতা ইত্যাদি। তাছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পরিব্রাজনের মাধ্যমে এক বাসস্থান থেকে অন্য বাসস্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই পরিব্রাজনের পথে তাদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রজাতি এক বাসস্থান থেকে অন্য বাসস্থানে অভিযোজন করতে গিয়ে জিনের মিউটেশন ঘটে। অর্থাৎ, নতুন পরিবেশে অভিযোজন ও অভিব্যক্তির ফলে নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

জীবমণ্ডলের উদ্ভিদ প্রজাতি যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ উদ্ভিদের সৃষ্ট খাদ্যের ওপর সমগ্র প্রাণীকুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, সেহেতু যেখানে উদ্ভিদগোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায় সেই স্থানে প্রাণী প্রজাতির আধিক্য ঘটে। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জলবায়ু ও মৃত্তিকার অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকায় সর্বাধিক উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দেখা যায়। ফলে উপরিউক্ত অঞ্চলে সর্বাধিক জীববৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিষুবরেখা থেকে কর্কটক্রান্তি ও

Scanned with CamScanner

মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী দেশগুলি, যেমন—ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত, পেরু কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশগুলি 'মেগা বৈচিত্র্য' দেশ রূপে পরিচিত।

● **ভারতের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity in India) :** ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমিরূপগত অবস্থান, জলবায়ুর বিভিন্নতা, মৃত্তিকার ভিন্ন আঞ্চলিক বণ্টন হেতু নানান উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি দেখা যায়। পৃথিবীর মোট ভূভাগের 2% এবং জীব প্রজাতির 6% ভারতীয় উপমহাদেশে উপস্থিত।

● **ভারতের জীববৈচিত্র্যর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব :** ভারতে নানান ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অবস্থান ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী সারণি 6.1-এ ভারতের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা উল্লেখ করা হল—

সারণী 6.1: ভারতের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা

জীবগোষ্ঠী	প্রজাতির সংখ্যা	জীবগোষ্ঠী	প্রজাতির সংখ্যা
অ্যানজিওস্পার্ম (গুপ্তবীজী উদ্ভিদ)	17,500	পাখি	1,232
জিমনোস্পার্ম (ব্যক্তবীজী)	64	সরীসৃপ	456
টেরিডোফাইটা (ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ)	1,100	উভচর	209
ব্রায়োফাইটা (মস্ জাতীয় উদ্ভিদ)	2,850	মাছ	2,546
লাইকেন (শৈবাল তুল্য পুষ্পক ছত্রাক)	2000	আর্থোপোডা (সন্ধিপদ)	68,389
ছত্রাক	14500	মোলাস্কা (শামুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী)	5,070
শৈবাল	6500	প্রোটোজোয়া (আণুবীক্ষণিক আদ্য প্রাণী)	2,577
ব্যাকটেরিয়া	850	অন্যান্য অমেরুদণ্ডী	8,329
স্তন্যপায়ী	390		

[**Source :** Ministry of Environment & Forest, Govt. of India]

6.1.3 *জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ (Types of Biodiversity) :*

জীববৈচিত্র্যের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে জীববৈচিত্র্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— (1) জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity), (2) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity) ও (3) বাস্তুতান্ত্রিক বা বাসস্থলগত বৈচিত্র্য (Ecosystem or Habitat Diversity)।

(1) জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity) : উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যে জিনের তারতম্যের ফলে পৃথিবীর নানাস্থানে ভিন্নধর্মী ও নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, জিনের পার্থক্যের জন্য প্রজাতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রজাতির মধ্যে যত জিনগত বৈচিত্র্য দেখা যাবে, ততই বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিটি প্রজাতি অধিকমাত্রায় অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করবে এবং নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। U.S. Congress (1990)-এর মতে, "Genetic diversity is the combination of different genes found within a population of single species and the patterns of variation found within different populations of the same species."

● **জিনগত বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Genetic Diversity) :**

(1) একটি নির্দিষ্ট বাসস্থানে বা বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে জিনের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

(2) জিনের গঠনগত বৈচিত্র্যের ওপর প্রজাতির আচরণ, বংশবৃদ্ধি, প্রজনন ও অভিযোজনের পার্থক্য ঘটে।

(3) জিনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গাঠনিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়।

(4) পরিবেশের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক পরিবর্তনের ফলে প্রজাতি জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন পরিবেশে অভিযোজিত হয়।

Scanned with CamScanner

(5) প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য প্রজাতিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে।
(6) প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য কমে গেলে পরিবেশ থেকে প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে।

জিনগত বৈচিত্র্য : পপুলেশন (Population)→ ব্যক্তি (Individual) → ক্রোমোজোম (Chromosome) → জিন (Gene) →নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)।

(2) প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity) : সাধারণভাবে, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলতে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, প্রাণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অথবা বৃহৎ অর্থে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি ও পার্থক্যকে বোঝায়। প্রজাতি বৈচিত্র্যের (Species Diversity) সমার্থক শব্দরূপে জীববৈচিত্র্যকেও ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাস্তুতন্ত্র প্রতিটি জীবের নির্দিষ্ট সংখ্যা ও তার প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। নিরক্ষীয় বৃষ্টিঅরণ্য বাস্তুতন্ত্রে (Equatorial Rainforest Ecosystem) উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি সর্বাধিক। প্রজাতি বৈচিত্র্যের পরিধি যত বেশি হবে ততই খাদ্যশৃঙ্খলের (Food Chain) সংখ্যা এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। নিরক্ষীয় বৃষ্টিঅরণ্য বাস্তুতন্ত্র বর্তমানে 'Biodiversity Hotspot'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। U.S. Congress (1990)-এর মত অনুসারে "Species diversity is the variety and abundance of different types of organisms which inhabit in an area."

- **প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Species Diversity) :**

(1) স্থলজ, জলজ বা বায়বীয় বাসস্থানে, বৃহৎ অর্থে পার্থিব বা জলজ বাস্তুতন্ত্র বা বায়োমে প্রজাতি বৈচিত্র্য বিভিন্ন হয়ে থাকে।
(2) কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্রে প্রজাতির বৈচিত্র্য বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।
(3) কোনো নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্র বা বায়োমে প্রজাতির বৈচিত্র্য থেকে প্রজাতির সংখ্যা, শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র জানা যায়। আবার, একই প্রজাতির ভিন্ন শ্রেণি, গোত্র, বর্ণও লক্ষ করা যায়।
(4) কোনো বাস্তুতন্ত্রে প্রজাতির সংখ্যা থেকে বাস্তুতন্ত্রে প্রাচুর্যতা বা স্বল্পতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।
(5) প্রাকৃতিক অঞ্চল ভেদে বাস্তুতন্ত্র বা বায়োমে প্রজাতির সংখ্যাভিত্তিক পার্থক্য দেখা যায়।
(6) পৃথিবীর বিভিন্ন বায়োমের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সর্বাধিক প্রজাতিগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।
(7) কোনো বাস্তুতন্ত্র বা বায়োমে প্রজাতির সংখ্যা যত বেশি হয় তত খাদ্যশৃঙ্খল ও খাদ্যজালিকার উপস্থিতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে।
(8) প্রজাতির বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক পরিবেশের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেমন—জলবায়ু, শিলা, মৃত্তিকার উর্বরতার ওপর নির্ভরশীল।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য : রাজ্য (Kingdom)→ পর্ব (Phylum) → শ্রেণি (Class) → বর্গ(Order) →গোত্র (Families) → গণ (Genera) → প্রজাতি (Species) → পপলুশেন (Population) → ব্যক্তি (Individual) ।

(3) বাস্তুতান্ত্রিক বা বাসস্থলগত বৈচিত্র্য (Ecosystem or Habitat Diversity) : একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার বাসস্থল লক্ষ করা যায়। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে উপাদানের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—স্থলজ ও জলজ বাস্তুতন্ত্র। এই স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আবার বিভিন্ন ধরনের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে। যেমন— অরণ্য, মরুভূমি ও তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র। আবার জলজ বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে স্বাদুজল ও লবণাক্ত জলের বাস্তুতন্ত্র দেখা যায়। প্রত্যেকটি বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদে উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর সংখ্যা ও আকারের তারতম্য দেখা যায় (Variation of habitats/ecological niche/ ecological community or in the broad sense ecosystem in a specific natural environment or geographical region.)। এদের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ দেখা যায় যা নীচে প্রবাহ চিত্রে (চিত্র 6.1) দেখানো হল—

Scanned with CamScanner

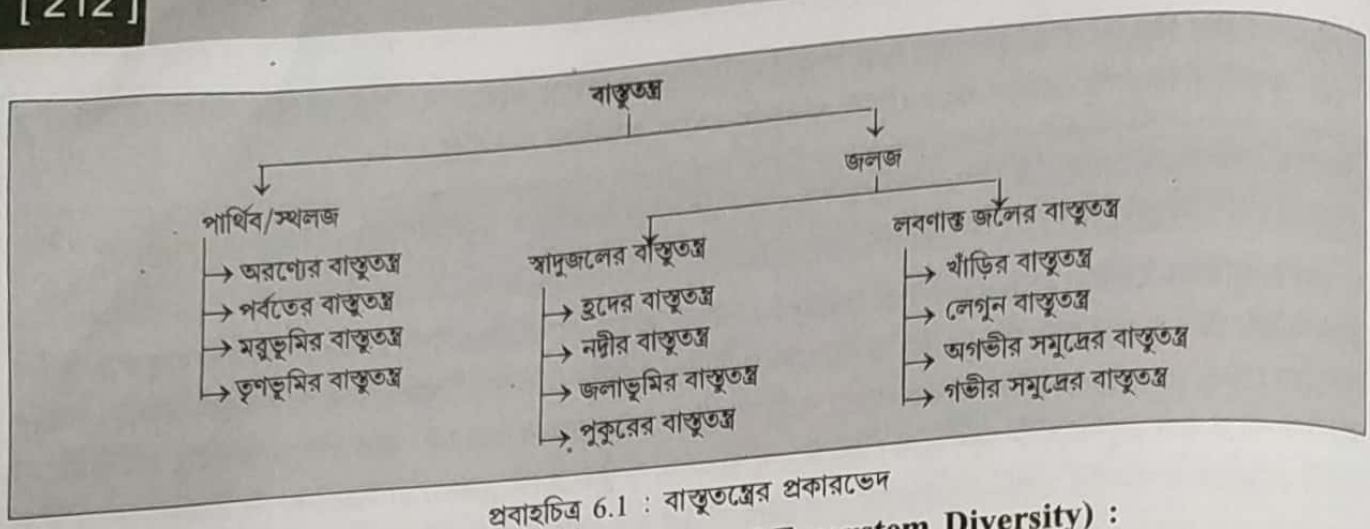

প্রবাহচিত্র 6.1 : বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ

▶ **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Ecosystem Diversity) :**

(1) জৈব ও অজৈব পরিবেশের উপাদানের পার্থক্য ও আন্তঃপ্রক্রিয়ায় পৃথক পৃথক বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য গড়ে ওঠে।

(2) বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি, প্রজাতির জিনগত পার্থক্য ও একই প্রজাতির অভিযোজন এবং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

(3) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের সরবরাহ বিভিন্ন মাত্রায় হওয়ায় একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থানকারী বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের শক্তি অর্জন, স্থানান্তর ও ব্যবহার ভিন্ন মাত্রায় হয়ে থাকে।

(4) কিছু কিছু প্রজাতির একটি নির্দিষ্ট বাসস্থলে বসবাস সত্ত্বেও তাদের বাস্তুতান্ত্রিক নিচ্ (Niche) পার্শ্ববর্তী বাস্তুতন্ত্রের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(5) একই বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে ও নির্দিষ্ট প্রজাতি ধারাবাহিকভাবে ক্লাইমেক্স স্তরে অভিযোজিত বা স্থানান্তরিত হয়।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য : বায়োম (Biome)→ জীব ভৌগোলিক অঞ্চল (Bio Geographical Region) → ল্যান্ডস্কেপস্ (Landscapes) → বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) → বাসস্থান (Habitat)→ নিচ্ (Niche) → পপলুশেন (Population)।

6.1.4 *বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের সূচক (Index for the Determination of the Ecological Biodiversity) :*

1972 সালে হুইটেকার (Whittaker) বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক নির্ধারণ করেন। বাস্তুবিদ্ হুইটেকার সর্বপ্রথম কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থানে নির্দিষ্ট প্রজাতির সংখ্যা, আয়তন ও ঘনত্ব বোঝাতে গিয়ে আলফা, বিটা ও গামা বৈচিত্র্য বা সূচক আবিষ্কার করেন।

● **আঞ্চলিক বা ক্ষুদ্র জীববৈচিত্র্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Regional or Micro Biodiversity) :**

আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—আলফা-বৈচিত্র্য (α-Diversity), বিটা-বৈচিত্র্য (β-Diversity) ও গামা বৈচিত্র্য (γ-Diversity) ।

(1) **আলফা সূচক বা বৈচিত্র্য (α-Diversity) :** বিজ্ঞানী হুইটেকার অবৈজ্ঞানিক বা স্থানীয় স্তরে বা বাসস্থানে প্রজাতির সংখ্যা বা গড় বোঝাতে আলফা বৈচিত্র্য বা সূচক ব্যবহার করেন।

● **আলফা-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of α-Diversity) :**

(i) আলফা-বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় বা আঞ্চলিক জলজ, স্থলজ ও বায়বীয় বাসস্থলের বিষয়ে বিবেচনা করা হয়।

Scanned with CamScanner

(ii) এই তিন ধরনের বাসস্থলে প্রজাতির মোট সংখ্যা অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির গড়কে নির্ণায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) আলফা-বৈচিত্র্যের সাহায্যে উক্ত অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র বাসস্থলে প্রজাতির প্রাচুর্য বা স্বল্পতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

(iv) প্রজাতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আলফা-বৈচিত্র্য বা নিদের্শিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

(2) **বিটা সূচক বা বৈচিত্র্য (β-Diversity) :** বিটা-বৈচিত্র্যের ধারণার উদ্ভাবক হুইটেকার-এর মতে, আন্তঃপ্রাকৃতিক স্থলজ বা জলজ বাসস্থলে আন্তঃপ্রজাতির বৈচিত্র্যকে বিটা-বৈচিত্র্য বা বিটা-সূচক বলে (Species Differentiation Among Habitats)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাদু জলের পুকুর ও হ্রদে উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও উভয়ই জলজ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত। উক্ত বৈচিত্র্যটিই হল বিটা-বৈচিত্র্য। প্রকৃতিতে প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ বাসস্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির মধ্যে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটি বৃহৎ অঞ্চল বা দেশে বিভিন্ন স্থলজ ও জলজ বাসস্থলে প্রজাতির মোট সংখ্যা হল বিটা-বৈচিত্র্য। বিজ্ঞানী হুইটেকার বিটা-বৈচিত্র্য নির্ণয়ের সূত্র দিয়েছেন, যথা— $\beta=\frac{\gamma}{\alpha}$

- **বিটা-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of β-Diversity) :**

(i) বৃহৎ অঞ্চল বা দেশের একই প্রকৃতির বাসস্থলে প্রজাতির মোট সংখ্যা হল বিটা-বৈচিত্র্য।

(ii) একটি বৃহৎ অঞ্চল বা দেশকে বাসস্থলের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য প্রজাতির বসবাসের অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা যায়। সামগ্রিক বাসস্থলে প্রজাতির মোট সংখ্যা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল বিটা।

(iii) বিটা-বৈচিত্র্যের সাহায্যে বৃহৎ অঞ্চলে প্রজাতির মোট সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ও ভৌগোলিক বণ্টন সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

(iv) আন্তঃপ্রাকৃতিক স্থলজ ও জলজ বাসস্থলে প্রজাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিটা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

(v) প্রজাতির সংরক্ষণ, বংশবিস্তার ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক নির্দেশক হল বিটা বৈচিত্র্য।

(3) **গামা সূচক বা বৈচিত্র্য (γ-Diversity) :** কোনো বৃহৎ ভৌগোলিক পরিবেশে প্রাকৃতিক স্থলজ বা জলজ বাসস্থলে গোষ্ঠীর বা প্রজাতির গোষ্ঠীগত বিভিন্নতা কারণে সৃষ্ট জীববৈচিত্র্যকে গামা-বৈচিত্র্য বলে। হুইটেকারের মতে, গামা বৈচিত্র্য হল, "...the total species deversity in a landscape." একটি বৃহৎ প্রাকৃতিক ভূখণ্ডে স্থানীয় বা আঞ্চলিক, মাঝারি ও বৃহৎ স্থলজ ও জলজ বাসস্থলের উপস্থিতি রয়েছে। হুইটেকার একই গোষ্ঠীর বা প্রজাতির বিভিন্ন বাসস্থলে তথা সামগ্রিক অর্থে কোনো বৃহৎ ভৌগোলিক পরিবেশে গোষ্ঠী বা প্রজাতির মোট সংখ্যাকে বোঝাতে গামা-বৈচিত্র্যের ধারণাটির প্রবর্তন করেন এবং এর নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন, যা হল— $\gamma \times \alpha \times \beta$।

- **গামা-বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of γ-Diversity) :**

(i) বৃহৎ ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্ন বাসস্থলে আন্তঃগোষ্ঠী বা প্রজাতির মোট সংখ্যা নির্ধারক হল গামা বৈচিত্র্য।

(ii) গামা বৈচিত্র্যের দ্বারা খুব সহজেই ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ভৌগোলিক পরিসরে একই গোষ্ঠী বা ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রজাতির মোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায়।

(iii) একই প্রজাতি বিভিন্ন বাসস্থলে ভিন্ন চরিত্রের হলেও অভিযোজন ও বাস্তুতান্ত্রিক বিবর্তন একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিক পথেই সংঘটিত হয়।

(iv) সর্বোপরি বাসস্থলভিত্তিক প্রজাতির সংখ্যা নির্ধারণ, গোষ্ঠীর প্রাচুর্য ও স্বল্পতা খুব সহজেই গামা-বৈচিত্র্যের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় এবং প্রজাতির সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক নির্দেশক।

উপরিউক্ত জীববৈচিত্র্য ছাড়াও আধুনিক ধারণানুসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে নতুন এক ধরনের জীববৈচিত্র্যের ধারণার সূত্রপাত হয়েছে যা 'অন্ধকার বৈচিত্র্য' বা 'Dark Diversity' নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

● **অন্ধকার বৈচিত্র্য (Dark Diversity) :** অন্ধকার বৈচিত্র্য কথাটির 'Species Pool' শব্দটির থেকে উদ্ভব ঘটেছে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বাসস্থলের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চল বা বাসস্থালে প্রজাতির জন্ম, বৃদ্ধি ও বিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রজাতির অনুপস্থিতিই হল 'অন্ধকার বৈচিত্র্য' বা 'Dark Diversity' (Dark diversity is the set of species that are absent from a study site but present in the surrounding region and potentially able to inhabit particular ecological condition.) । এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাসস্থলে সকল উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির জন্ম ও বৃদ্ধির আনুষঙ্গিক পরিবেশ রয়েছে বলে মনে করা হলেও কিছু কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে তা অনুকূল নাও হতে পারে। আলাদা, বিটা এবং গামা বৈচিত্র্য হল একটি নির্দিষ্ট বাসস্থলে প্রজাতির উপস্থিতির বৈচিত্র্য যা যে-কোনো স্কেলে পরিমাপযোগ্য। কিন্তু অন্ধকার বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রজাতির অনুপস্থিতি হল বিচার্য বিষয়, যা উপরিউক্ত স্কেলে পরিমাপযোগ্য নয়। বর্তমানে উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জানা যায় যে একটি নির্দিষ্ট স্থলজ বা জলজ বাসস্থলে অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবেরও 'Habitat Niche' বা 'Spatial Niche'-এর অস্তিত্ব রয়েছে। অতএব বৃহৎ আঞ্চলিক পরিবেশে কোনো না কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির উপস্থিতি বর্তমান।

6.1.5 *জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব (Importance of Biodiversity) :*

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অসীম। প্রকৃতপক্ষে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বলতে জীবগোষ্ঠী বা উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা যে সমস্ত সুযোগ পেয়ে থাকি তাকে বোঝানো হয়। এইসব সুযোগ-সুবিধাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়ে থাকে। যথা— অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance), বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব (Ecological Importance), পরিবেশগত গুরুত্ব (Environmental Importance) এবং সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance)। এই মতামত থেকে জীববৈচিত্র্যের মূল্যকে দুটিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

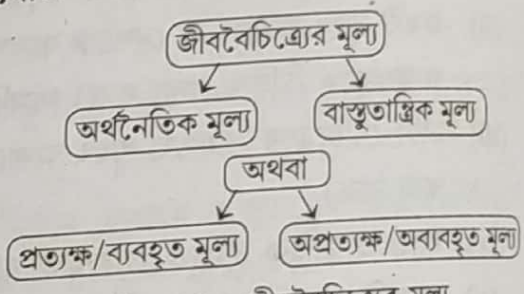

চিত্র 6.2 : জীববৈচিত্র্যের মূল্য

(1) **প্রত্যক্ষ বা ব্যবহৃত মূল্য (Direct Use Value) :** উদ্ভিদ বা প্রাণীগোষ্ঠী থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন উপাদান আমরা পেয়ে থাকি, যেমন— খাদ্য, কাঠ, চামড়া, শিং ইত্যাদি। উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠী থেকে প্রাপ্ত এই সুবিধাকে টেনজিবল বেনিফিট্ (Tangible Benefit) অথবা প্রত্যক্ষ সুবিধা বলে।

(2) **অপ্রত্যক্ষ বা অব্যবহৃত মূল্য (Indirect Use Value) :** প্রত্যক্ষভাবে না হলেও রাস্তায় চলার পথে প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরূপ শোভা ও মনোরম শোভা আমরা উপভোগ করি। তা ছাড়া বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর (যেমন—পাখি) সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। এটি হল অপ্রত্যক্ষ মূল্য। বিষয়টি বোঝার সুবিধার্থে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বকে এবার বিভিন্ন ভাগে আলোচনা করা হল।

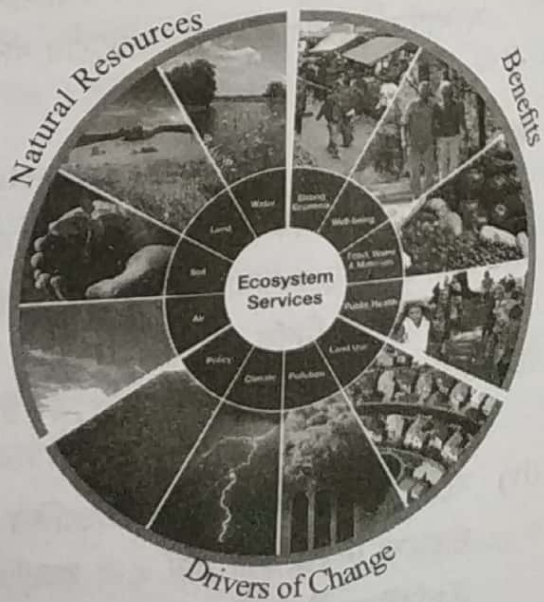

চিত্র 6.3 : বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব

■ **বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব (Ecological Services or Ecosystem Services or Benefits) :** জীববৈচিত্র্যের বহুমুখী বাস্তুতান্ত্রিক উপযোগিতা রয়েছে। এই উপযোগিতাগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) জীববৈচিত্র্য জলজ সম্পদ সংরক্ষণ ও জলদূষণকে থেকে প্রতিরোধ।

(ii) বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত করে ও দূষিত বায়ুকে পরিশোধিত করে।

(iii) মৃত্তিকা সৃষ্টি, সংরক্ষণ, এবং মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করে।

(iv) আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে ও জলবায়ুর অবাধ পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে।

(v) জলচক্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতাকে বহুলাংশে পরিচালিত করে।

Scanned with CamScanner

(vi) জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রকে (Bio Geo-Chemical Cycle) সঠিকভাবে পরিচালিত করে।
(vii) বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতাবস্থাকে (Ecological Stability) বজায় রাখে।
(viii) জীববৈচিত্র্য মনুষ্যসৃষ্ট অধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে বৃহৎ অর্থে পরিবেশকে পরিশোধিত করে।

জীববৈচিত্র্য প্রকৃতপক্ষে 'প্রকৃতি সৃষ্ট জাদুঘর' (Nature's Museum), যার বাস্তুতান্ত্রিক ও পরিবেশগত সংরক্ষণের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজন রয়েছে।

■ **অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Services or Benefits) :** জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহুবিধ। যথা—

(i) উদ্ভিদ প্রজাতি দিবালোকে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং খনিজ দ্বারা সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে **খাদ্য উৎপাদন** করে নিজের কোশে সংরক্ষণ করে। মানুষ ও বেশির ভাগ প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল।

(ii) উদ্ভিদ প্রজাতি বা বনজ সম্পদ থেকে মানুষের **দৈনন্দিন ব্যবহারের নানাবিধ পোশাক** প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে আধুনিক ও সূক্ষ্ম মসৃণ, উন্নত গুণমানের জামাকাপড় এই উদ্ভিদ প্রজাতি থেকেই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা হচ্ছে।

(iii) জীববৈচিত্র্য থেকে বিভিন্ন **জীবনদায়ী ওষুধ প্রস্তুত** করা হয়। জটিল ক্যান্সার রোগের প্রতিষেধক এই জীববৈচিত্র্য থেকেই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা 90টি উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে 120 রকমের অতিপ্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি করেছেন। এমনকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রায় 80 শতাংশ মানুষ ভেষজ ওষুধের জন্য প্রত্যক্ষভাবে গাছপালার ওপর নির্ভর করে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলি তার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদগুলি (উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি) 'Bio-piracy'-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বার্থে নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ প্রস্তুত করছে, যার প্রকৃতমূল্য সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরে। এর ফলে প্রকৃত উৎপাদনকারী দেশ এই মূল্যবান সম্পদ উৎপাদন করেও এর উপযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নীচের সারণিতে (সারণী 6.2) কয়েকটি উদ্ভিদ প্রজাতি ও তাদের থেকে উৎপন্ন ওষুধের নাম উল্লেখ করা হল—

সারণী 6.2 : বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে প্রাপ্ত বিবিধ রোগের ওষুধসমূহ

রোগ		ওষুধ	উদ্ভিদ প্রজাতি
(১)	ক্যান্সার	ট্যাকসল (Taxol)	Taxus baccata
(২)	ম্যালেরিয়া	কুইনাইন (Quinine)	Chinchona ledgeriana
(৩)	রক্তচাপ বৃদ্ধি	রায়োলোফিয়া (Rauwolfia)	Rauwolfia serpentina
(৪)	নার্ভ সংক্রান্ত ব্যাধি	ব্রাহ্মী (Brahmin), ব্যাকোসাইডস A ও B (Bacosides A and B)	Bacopa moniera linn
(৫)	লিউকোমিয়া	ভিনক্রিসটিন (Vincristine)	Catharanthus roseus
(৬)	ব্যথা	মরফিন (Morphin)	Papave somniferum

(iv) জীববৈচিত্র্য থেকে বিভিন্ন জ্বালানি ও কাঠ উৎপাদিত হচ্ছে। শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল এই জীববৈচিত্র্য থেকে সরবরাহ করা হয়। খেলাধুলার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম জীববৈচিত্র্য থেকে বিভিন্ন অত্যাধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।

(v) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ স্থানগুলিকে সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে Eco-Tourism-এর জন্যও স্থানগুলি নির্বাচিত হয়েছে।

6.1.6 *জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Biodiversity Conservation) :*

জীববৈচিত্র্য বা 'Biodiversity' শব্দটি 'Bio' ও 'Diversity' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত যেখানে 'Bio' শব্দটি অর্থ বা 'Life' অর্থাৎ জীবন এবং 'Diversity' শব্দটির অর্থ 'বৈচিত্র্য'। অর্থাৎ, এককথায় কোনো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে সকল জীবের জিনগত, প্রজাতিগত বা বাস্তুতন্ত্রগত তারতম্যের সামগ্রিক উপস্থিতিকে জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity বলে।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে, 1650 সালের আগে প্রজাতির বিলুপ্তির হার ছিল 1-5 (প্রতি দশকে), 1650 সালের পরে প্রজাতির অবলুপ্তির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1000-1500 (প্রতি দশকে)। যে সকল কারণে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজন নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা (Maintain the Stability of Environment) :** পরিবেশে জৈব-অজৈব উপাদানের আন্তঃক্রিয়ায় গড়ে ওঠে সুস্থ ও ভারসাম্যযুক্ত পরিবেশ। ফলে পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট জীবের অবলুপ্তি বা ধ্বংসের ফলে সামগ্রিক অর্থে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এমনকি কোনো প্রজাতি তার খাদ্যের অভাবে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

(2) **বাস্তুতন্ত্র রক্ষা (Protection of Ecosystem) :** পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠী এবং অজৈব উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় পৃথিবীতে অসংখ্য বাস্তুতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এইসকল বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজকের মধ্যে সুগঠিত পুষ্টিচক্র লক্ষ করা যায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতি অর্থাৎ উৎপাদক বা খাদক বাস্তুতন্ত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পুষ্টিচক্র অথবা বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

(3) **পরিবেশগত দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Environmental Pollution Control) :** জীবমণ্ডলে সবুজ উদ্ভিদ একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। সবুজ উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে বিভিন্ন পুষ্টি মৌল, জল ও CO_2 গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে নিজদেহে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্যের ওপর সমগ্র প্রাণীকুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বর্তমানে জনবিস্ফোরণের ফলে প্রাকৃতিক বনভূমি ধ্বংস করে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান আজ মানবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে ভীষণভাবে দূষিত। সবুজ উদ্ভিদ CO_2 শোষণ করে মৃত্তিকা, জল, বায়ু দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে অনেকাংশে রক্ষা করে। যেখানে সবুজ উদ্ভিদের ঘনত্ব বেশি রয়েছে সেখানে প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ দূষণের হারও অপেক্ষাকৃত কম। অতএব এককথায় বলা যায়, সবুজায়ন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।

(4) **জলচক্র ও পুষ্টিচক্রের উপস্থিতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা (Existence of Hydrological Cycle and Nutrient Cycle and Maintenance of Environmental Stability) :** বায়ুমণ্ডল থেকে অধঃক্ষেপিত জলবিন্দু সবুজ উদ্ভিদের ক্যানোপিতে (Canopy) সঞ্চিত হয়। পরবর্তীধাপে কাণ্ডপ্রবাহ, ভূপৃষ্ঠ প্রবাহ, উপ-পৃষ্ঠীয় প্রবাহ এবং ভৌমজল প্রবাহের মাধ্যমে নদী, হ্রদ,সমুদ্রে এসে জমা হয়। আবার, উদ্ভিদের ক্যানোপি সঞ্চয় থেকে বাষ্পীয় প্রস্বেদন এবং ভূপৃষ্ঠের জলধারা ও সমুদ্রের থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পুনরায় জলবিন্দু বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এভাবে জলচক্রের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকে থাকে। অপরদিকে পরিবেশ থেকে পুষ্টিমৌল নিয়ে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এই খাদ্যের ওপর শাকাশী, মাংসাশী, সর্বভুক ও বিয়োজক অর্থাৎ প্রাণীগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। জীবগোষ্ঠীর মৃত্যুর পরে মৃত জীবদেহ বিয়োজনের মাধ্যমে পুষ্টিমৌলগুলি পরিবেশে ফিরে যায়। পরবর্তীকালে উদ্ভিদ এই পুষ্টিমৌলগুলিকে পুনরায় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে পুষ্টিচক্র সম্পন্ন করে। প্রকৃতপক্ষে জলচক্র ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্বের ওপর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকার বিষয়টি নির্ভর করে।

(5) **জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Values of Biodiversity) :** পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ থেকে মানবজাতি যে সুযোগ-সুবিধাগুলি পেয়ে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খাদ্য, বস্ত্র,ওষুধ, খেলাধুলোর সরঞ্জাম , আসবাবপত্র, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি। তা ছাড়া বন্যপশুপাখির চামড়া, লোম, দাঁত প্রভৃতিও মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে। অতএব, জীববৈচিত্র্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব মানবসমাজের কাছে অপরিসীম।

Scanned with CamScanner

(6) **পর্যটন ও নান্দনিক মূল্যবোধ (Tourism and Aesthetic Values) :** জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যতার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইকোট্যুরিজম হাব গড়ে উঠেছে। এটি মানুষের আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন ও নান্দনিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে।

(7) **গবেষণা ও আবিষ্কার (Research and Invention) :** জীববৈচিত্র্যকে এককথায় 'প্রাকৃতিক জাদুঘর' বা 'Nature's Museum' বলা হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীতে 80-90 মিলিয়নের বেশি প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যার মধ্যে 10-15 মিলিয়ন প্রজাতিকে শনাক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যেকদিন নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হচ্ছে। মানবজাতি জীবনধারণ ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অসংখ্য বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির গৃহস্থালীকরণ করেছে। এই সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি থেকে মানুষ নানা জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করেছে। এমনকি জনবিস্ফোরণের সঙ্গে সমতা রেখে খাদ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনতে প্রজাতির জিন বা DNA-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব করা হয়েছে।

(8) **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে অতি সংকটাপন্ন, সংকটাপন্ন ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ (Conservation of Critically Endangered, Endangered and Vulnerable Species to Maintain the Environmental Stability) :** মনুষ্যজাতি বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ায় অতি সংকটাপন্ন, সংকটাপন্ন, বিপন্ন, বিপদাপন্ন ও বিরল প্রজাতিকে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু পদ্ধতির সাহায্যে সংরক্ষণের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের বা বৃহৎ অর্থে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করছে।

6.1.7 *জীববৈচিত্র্য ধ্বংস (Biodiversity Loss) :*

কোনো প্রাকৃতিক বাসস্থান বা মনুষ্যসৃষ্ট বাসস্থান থেকে কোনো নির্দিষ্ট জৈবিক প্রজাতি বা গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বা হ্রাসকে প্রজাতি বিলুপ্তি (Species Extinction) বলে। অর্থনৈতিক মানুষ (Economic Man) পৃথিবীতে আসার পূর্বে প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ ছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। বর্তমানে মনুষ্যসৃষ্ট কারণই এই প্রজাতি বিলুপ্তির অন্যতম উৎস। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রজাতি বিলুপ্তির হার তথা মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের হার 1850 সালের পর থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1600-1850 সালের মধ্যে প্রত্যেক দশকে প্রজাতি বিলুপ্তির হার ছিল 2 থেকে 3টি। 1850 সালের পর থেকে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রত্যেক দশকে প্রায় হাজারটি। পল এরলিচ্ (Paul Ehrlich)-এর সমীক্ষার পূর্বাভাস অনুযায়ী 2050 সালের মধ্যে সব প্রজাতির 1/2 অথবা 1/3 অংশ বিলুপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এখন পৃথিবীতে প্রায় 4,00,00,000টি প্রজাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যার মধ্যে প্রতি বছর প্রায় 10000 প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলিই প্রধান, যথা— চাষযোগ্য ভূমির সম্প্রসারণ (Extension of Agricultural Land), কৃষিশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase in Agricultural Productivity), বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ (Construction of Dams and Reservoirs), বনচ্ছেদন (Deforestation), দ্রুত মৃত্তিকা ক্ষয় (Accelerated Soil Erosion) , শিল্পোন্নতি (Industrial Development), নগরায়ণ (Urbanization), পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution) ইত্যাদি।

■ **জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ (Causes of Biodiversity Loss) :** প্রজাতি বিলুপ্তি ও নতুন প্রজাতি সৃষ্টি, প্রজাতি বিবর্তনের একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি বা ধাপ। নতুন প্রজাতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতি বিলুপ্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। বর্তমানে মনুষ্যসৃষ্ট কারণে অধিক হারে প্রজাতি বিলুপ্তির ফলে প্রজাতি হ্রাসের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রজাতি বিলুপ্তি বা ধ্বংসের কারণগুলিকে নীচে প্রবাহ চিত্রে (চিত্র 6.4) দেখানো হল—

(A) জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Natural Causes of Biodiversity Loss): জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের উপরিউক্ত প্রাকৃতিক কারণগুলিকে বিস্তারিত ভাবে এবার আলোচনা করা হল।

(i) বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীর তাপমাত্রা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এই অবস্থার সঙ্গে অভিযোজিত হতে না পেরে অধিক হারে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

Scanned with CamScanner

(ii) পাত সঞ্চারণের ফলে ও অন্যান্য কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত অগ্ন্যুৎপাত ঘটে চলেছে যার ফলে প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি প্রতি বছর সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ (Causes of Biodiversity Loss)

A. প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)
- (i) জলবায়ু পরিবর্তন (Climatic Changes)
- (ii) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গম (Volcanic Eruption)
- (iii) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Natural Hazard & Disaster)
  - (a) ভূমিকম্প (Earthquake)
  - (b) ভূমিধস (Landslide)
  - (c) খরা (Drought)
  - (d) বন্যা (Flood)
  - (e) নদীবাঁধ ভাঙন (River Bank Erosion)
  - (f) ক্রান্তীয় ঘূর্ণাবর্ত (Tropical Cyclone) ইত্যাদি।

B. মনুষ্যসৃষ্ট কারণ (Anthropogenic Causes)
- (i) চাষযোগ্য জমির সম্প্রসারণ (Extension of Agricultural land)
- (ii) রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি (Excessive Use of Chemical Fertilizer)
- (iii) রোগ (Diseases)
- (iv) পরিবেশগত দূষণ (Environmental Pollution)
- (v) জিনগত পরিবর্তন (Genetic Transformation)
- (vi) বাসস্থান ধ্বংস (Habitat Loss)
- (vii) জলাধার নির্মাণ (Construction of Dam & Reservoirs)
- (viii) সড়কপথ নির্মাণ (Road/Highway Construction)
- (ix) নগরায়ণ (Urbanization)
- (x) বনচ্ছেদন (Deforestation) ইত্যাদি।

প্রবাহ চিত্র 6.4 : মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস

(iii) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের ফলে, যেমন— উল্কাপাত, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খরা, বন্যা, মহামারী,নদীর বাঁধ ভাঙন, উপকূলীয় ক্ষয়, স্বাদু জলস্তরে লবণাক্ত জলের মিশ্রণের ফলে পৃথিবীতে প্রতি বছর হাজার হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত, প্রায় বিলুপ্ত, বিপন্ন, সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন। তা ছাড়া কার্বোনিফেরাস যুগে অতিরিক্ত হিমায়নের জন্য 50% উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া প্লিস্টোসিন হিমযুগেও বহু প্রজাতির মৃত্যু ঘটেছিল। ক্রিটেসাস যুগে পৃথিবীব্যাপী সর্বাধিক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গীরণ ও লাভাপ্রবাহের ফলে প্রচুর সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(B) জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মনুষ্যসৃষ্ট কারণসমূহ (Anthropogenic Causes of Biodiversity Loss) : মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলিকে নীচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল—

(i) বাসস্থল ধ্বংস (Habitat Loss) : বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসস্থল ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রধান কারণগুলি হল— প্রাকৃতিক বনভূমি বা বায়োমের মধ্য দিয়ে রাস্তা, রেললাইন নির্মাণ, খনন প্রক্রিয়া, বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ প্রভৃতি। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রজাতির ধ্বংসের হার সর্বাধিক। মানুষের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির বিস্তার ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি, যেমন—রাশিয়ার স্তেপস্, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরি, আর্জেন্টিনার পম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড, নিউজিল্যান্ডের ডাউনস্-এর অনেকাংশ আজ কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য যা পৃথিবীর সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল তাও আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। সামুদ্রিক বাদাবন (Swampy Forest)-এর মত বৃহৎ গতিশীল বাস্তুতন্ত্রও যা বর্তমানে উপকূলীয় মানবিক উন্নয়নের ফলে অনেকটাই ধ্বংস প্রাপ্ত।

(ii) অধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার (Excessive Use of Chemical Fertilizers and Pesticides) : দ্রুত জনবিস্ফোরণের ফলে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন সার ও কীটনাশক ওষুধ আবিষ্কার ও তার ব্যবহারও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর ফলে বিভিন্ন আণুবীক্ষণিক জীব এমনকি উদ্ভিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া প্রধান আল্লিক অজৈব যৌগ যা উদ্ভিদ ও মৃত্তিকায় বসবাসকারী প্রাণীর প্রত্যক্ষ বা

Scanned with CamScanner

পরোক্ষভাবে ক্ষতি করে, যথা—আর্সেনিক, পারদ, ক্রোমিয়াম, সিসা, ক্লোরিন, নিকেল, তামা, জিঙ্ক, বোরন প্রভৃতির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

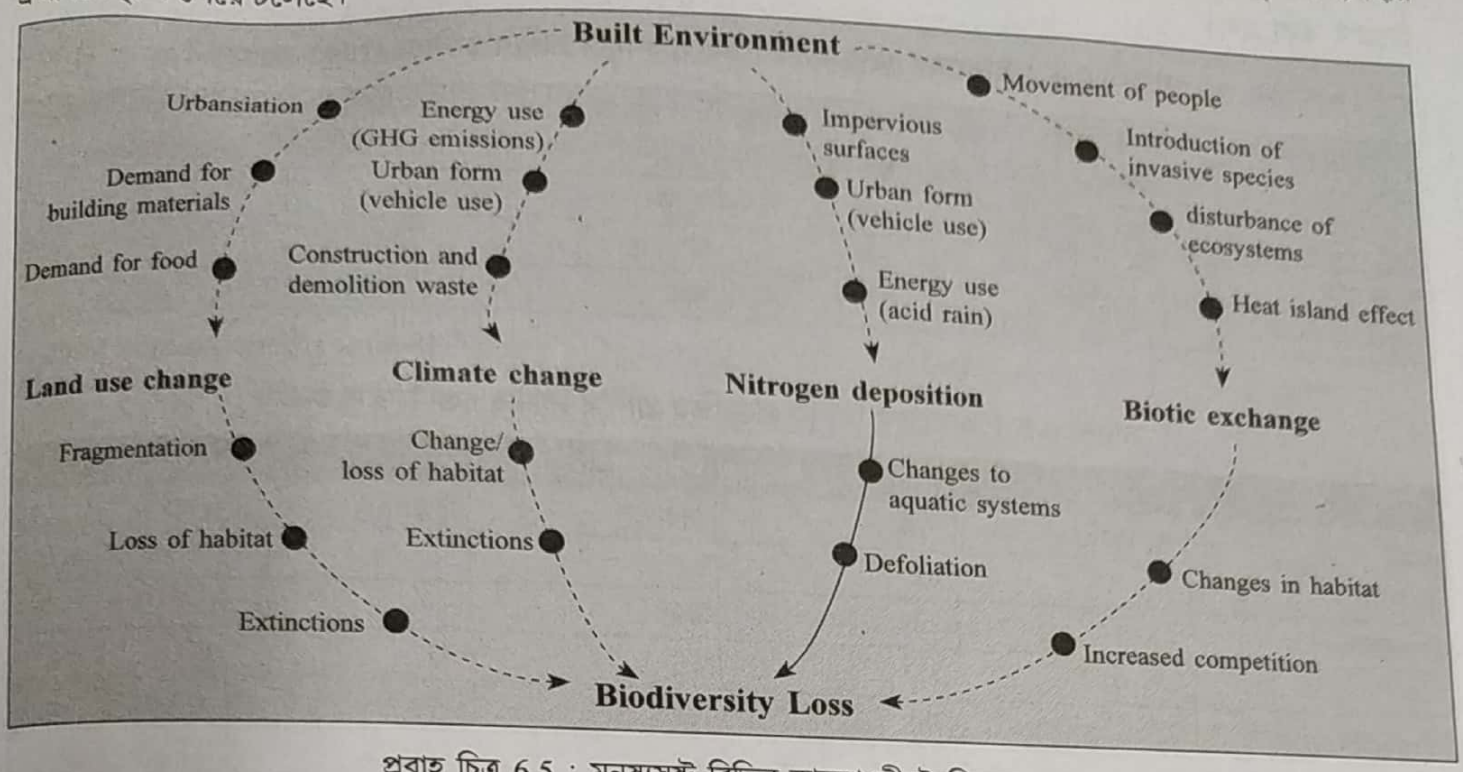

প্রবাহ চিত্র 6.5 : মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংস

(iii) পরিবেশ দূষণ (Environmental Pollution) : পরিবেশগত দূষণের মধ্যে প্রধানত জল,মৃত্তিকা ও বায়ুদূষণের ফলে প্রতি বছর কয়েকশো প্রজাতি (উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠী) পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই দূষণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেছেন, সেগুলি হল—অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ, ভূমির ব্যবহার, শিল্পায়ন, কৃষিতে অত্যধিক রাসায়নিক সার ও ওষুধের প্রয়োগ, অশিক্ষা, পরিবেশগত সচেতনতাএবং সামাজিক চেতনার অভাব।

(iv) বাঁধ এবং জলাধার নির্মাণ (Construction of Dam and Reservoirs) : অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খাদ্যের নিরাপত্তা সুনির্দিষ্ট করতে সারাবছরব্যাপী কৃষিশস্য উৎপাদনের জন্য বড়ো নদীগুলির প্রবাহপথে বিশাল বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শেষের তিন দশকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে একাধিক বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর ফলে শুধু উদ্ভিদ বা বন্য প্রাণীই ধ্বংস হবে না, হাজার হাজার স্থানীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত আদিবাসী মানুষ বাস্তুভূমি থেকে উচ্ছেদ হবে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী এই বাঁধ ও জলাধার নির্মাণের ফলে প্রচুর প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে প্রজাতি বিলুপ্তির সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব সারণি 6.3 -এ দেওয়া হল—

সারণী 6.3 : বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে প্রজাতি বিলুপ্তির পরিসংখ্যান

ভূ-তাত্ত্বিক কাল (Geological Period)	সময় (Time)bp	বিলুপ্তি (Extinction)
ওর্ডোভিসিয়ান	444 মিলিয়ন	সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ গোষ্ঠী থেকে 25 শতাংশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।
ডেভোনিয়ান	370 মিলিয়ন	সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ গোষ্ঠী থেকে 19 শতাংশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।
পার্মিয়ান	250 মিলিয়ন	54 শতাংশ গোষ্ঠী এবং 90 শতাংশ প্রজাতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত।
ট্রায়াসিক	210 মিলিয়ন	23 শতাংশ গোষ্ঠী এবং 1/2 প্রজাতি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত।
ক্রিটেসাস	65 মিলিয়ন	17 শতাংশ গোষ্ঠী এবং 50 শতাংশ প্রজাতি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত।
কোয়াটারনারি	—	বর্তমানে 1/3 থেকে 2/3 প্রজাতির বিলুপ্তি।

[**Source :** Cunnigham, W. & Cunnigham, M.A., 2003 : Principles of Environmental Science]

Scanned with CamScanner

বাসস্থান ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের হার উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংরক্ষণের আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও তার প্রায়োগিক দিক 1950-এর পর লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে 1992 সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত রিও-সামিট বা বসুন্ধরা সম্মেলনে পৃথিবী ও তার পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্যের বৃদ্ধি নিয়ে 178টি রাষ্ট্র চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করে প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এই বসুন্ধরা সম্মেলনে প্রকৃতি এবং প্রাচীন বন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণে কতকগুলি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আলোচনা করা হয়। কিন্তু কিছু উন্নত দেশ (যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) তার প্রতিবাদ করায় অন্যান্য দেশগুলি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। বিজ্ঞানীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী পৃথিবীতে বর্তমানে 40 মিলিয়ন প্রজাতির উপস্থিতি রয়েছে, যার মধ্যে 10,000 প্রজাতি প্রতি বছর বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। অনুরূপভাবে সামুদ্রিক প্রজাতিও আজ সামুদ্রিক জলদূষণ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ফলে বিলুপ্ত ও বিপন্নপ্রায়। বসুন্ধরা সম্মেলনে আরও একটি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছিল তা হল, উন্নত দেশগুলি বিনামূল্যে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জৈবিক প্রযুক্তিগুলি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে সরবরাহ করবে। সেক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রাপ্য লভ্যাংশ কিছুটা সাহায্যকারী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরিত করবে। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে চায়নি। এর কারণস্বরূপ বলা হয় যে, জৈবিক প্রযুক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেই দেশের নিজস্ব ও মেধাগত সম্পদ যা আইনবলে সংরক্ষিত। এর ফলে এই চুক্তিপত্র বাস্তবায়িত না হয়ে শুধু কাগজে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। তবে অংশগ্রহণকারী 178টি রাষ্ট্রের মধ্যে 150টি রাষ্ট্রই জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে স্বাক্ষর করে। এক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের চুক্তিপত্রে 3টি পরিকল্পনা সংযোজিত হয়।

(i) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সম্মতি ও নিশ্চিতকরণ।

(ii) জীববৈচিত্র্যের স্থিতিশীল ব্যবহার।

(iii) জৈবিক প্রযুক্তি সরবরাহকারী দেশে লভ্যাংশের সমবণ্টন।

এই চুক্তি 1993 সালের পরে বাস্তবায়িত হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোনো বাস্তবিক প্রয়োগ ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায় না।

6.3.1 *IUCN কর্তৃক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity Conservation by IUCN) :*

প্রজাতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল প্রজাতিগুলি কোন্ শ্রেণিতে অবস্থান করছে তা নির্ণয় করা। বর্তমানে বেশির ভাগ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলি ঝুঁকি কবলিত। ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রজাতির বিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এক্ষেত্রে IUCN (International Union for the Conservation of Nature)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাটি প্রজাতি সংরক্ষণে এবং প্রজাতির ঝুঁকির শ্রেণি মূল্যায়ণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 1948 সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল প্রকৃতির সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

চিত্র 6.18 : IUCN-এর প্রতীক চিহ্ন

(1) IUCN রেড লিস্ট অথবা রেড ডাটা বুক (IUCN Red List or Red Data Book) : IUCN-এর তত্ত্বাবধানে একটি মূল্যবান তথ্যভিত্তিক এবং সার্বিক পুনর্মূল্যায়ন ভিত্তিক পুস্তক প্রকাশিত হয় যা 'Red Data Book' নামে পরিচিত। 'Red Data Book' হল একটি বৃহৎ তথ্যভিত্তিক তালিকা বা পুস্তক, যা মূলত বিলুপ্ত, বিলুপ্তপ্রায়, সংকটাপন্ন, বিপন্ন, প্রায়বিপদাপন্ন জীব প্রজাতির একটি তালিকা। IUCN 'Red List' বা 'Red Data List' 1964 সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

➢ **IUCN Red List-এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ (Major Objectives of IUCN Red List) :** আন্তর্জাতিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট নির্ধারকের ওপর ভিত্তি করে Red Data List বা রেড ডাটা তালিকায় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে IUCN-এর প্রতিনিধিরা বিলুপ্ত, বিলুপ্তপ্রায়, বিপদসংকুল, বিরল, বিপদাপন্ন উদ্ভিদ

Scanned with CamScanner

ও প্রাণী প্রজাতিগুলিকে শনাক্তকরণের কাজে গভীরভাবে নিযুক্ত রয়েছেন। নীচে IUCN Red List-এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করা হল—

(1) IUCN আন্তর্জাতিক স্তরে জীবগোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির বর্তমান অবস্থার বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করে।

(2) বিপদাপন্ন বা বিপদসংকুল জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(3) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করে।

(4) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।

(5) সম্ভব হলে প্রতি 5 বছর পর্যন্ত অথবা 10 বছর অন্তর একবার করে প্রজাতির অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করে। IUCN-এর Red List কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এই মূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।

IUCN-ছাড়াও যেসকল সংস্থাগুলি প্রজাতির মূল্যায়নে ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— Bird Life International, Institute of Zoology, World Conservation Monitoring Centre, Species Survival Commission। যদিও এই সংস্থাগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রজাতির উৎপত্তি, বংশবিস্তার, অভিযোজন, অভিব্যক্তি, প্রজাতি ধ্বংসের কারণ এবং সংরক্ষণের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে থাকে।

➢ **বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির 1964-এর Red Data List (Red Data List of Threatened Plant Species of 1964) :** প্রাচীন নির্দেশকের দ্বারা বিপদসংকুল ও বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মূল্যায়ন করা হয়েছিল। 1964-এর 'Red Data List'-এ যেসব উদ্ভিদ প্রজাতির নাম তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে (কিছু নতুন নির্দেশক প্রয়োগ করে) 1997 সালে প্রকাশিত Red Data List-এ পুনর্নথিভুক্ত করা হয়।

➢ **2006-এর Red Data List (Red Data List of 2006) :**

4 মে, 2006-এ IUCN দ্বারা Red Data List পুনর্প্রকাশিত হয় যেখানে 40,168 টি প্রজাতি, 2,160 উপপ্রজাতি ও জলজ প্রজাতি এবং তাদের উপগোষ্ঠীর সার্বিক মূল্যায়নের তালিকা প্রকাশিত হয়।

➢ **2007-এর IUCN-এর Red Data List (Red Data List of 2007) :**

12 সেপ্টেম্বর, 2007-এ "World Conservation Union"-এর সহযোগিতায় বিপদাপন্ন প্রজাতির তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় গরিলা (Gorilla)-কে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে নিম্নভূমির গরিলাকে সংকটাপন্ন এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রসরিভার গরিলাকে অতিসংকটাপন্ন শ্রেণির অন্তর্গত হয় যা বর্তমানে পৃথিবী থেকে বিলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কারণগুলি হল চোরাশিকারী ও ইবোলা ভাইরাসের আক্রমণ। 2007-এর Red Data List অনুযায়ী 16306টি প্রজাতি সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং কিছু প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই Red Data List-এ মোট 61415 টি প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 2007-এর Red Data List-এ সুমাত্রার ওরাংওটাং (Orangutan) অতি সংকটাপন্ন এবং বোর্ণিও-র ওরাংওটাং (Orangutan) সংকটাপন্ন শ্রেণির অন্তর্গত প্রজাতিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

➢ **2008-এর Red Data List (Red Data List of 2008) :** 6 অক্টোবর, 2008-এর বার্সেলোনাতে অনুষ্ঠিত IUCN-এর "World Conservation Conference"-এ বলা হয়—...has confirmed an extinction crisis, with almost one in four (mammals) at risk of disappearing forever." এই সম্মেলনে আরও দেখানো হয় যে 5487টি স্তন্যপায়ীর মধ্যে 1141টি স্তন্যপায়ী প্রজাতি অত্যন্ত বিপদাপন্ন এবং বিলুপ্তির মুখে। এ ছাড়া 836 টি প্রজাতির ক্ষেত্রে তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

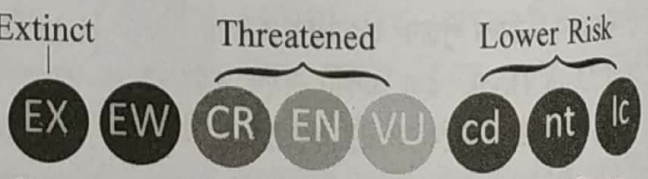

চিত্র 6.19 : Red Data List অনুসারে প্রজাতির শ্রেণিবিন্যাস

➢ **2012-এর Red Data List (Red Data List of 2012) :** 19 জুলাই, 2012 সালে 'Rio +20 Earth Summit' সম্মেলনে Red Data List প্রকাশিত হয় যেখানে আরও অতিরিক্ত 2000টি প্রজাতির নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে 4টি প্রজাতির নাম বিলুপ্তির তালিকায় এবং 2টি প্রজাতির পুনর্আবিষ্কার হয়েছে। IUCN 63837টি

Scanned with CamScanner

প্রজাতির মূল্যায়ন করে নাম প্রকাশিত করেছে যার মধ্যে 19817টি প্রজাতি বিপদাপন্ন এবং বিলুপ্তির পথে, 3947টি প্রজাতি অতি সংকটাপন্ন, 5766টি প্রজাতি সংকটাপন্ন এবং 10,000-এরও বেশি প্রজাতি বিপদাপন্ন রূপে নথিভুক্ত হয়েছে। 2012 সালের Red Data List-এ আরও দেখানো হয়েছে 41% উভচর প্রজাতি, 33% দ্বীপ গঠনকারী প্রবাল, 30% সরলবর্গীয় প্রজাতি, 25% স্তন্যপায়ী এবং 13% পক্ষী প্রজাতি বিপদাপন্ন। IUCN Red List-এ ভারত থেকে 132টি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির নাম অতি সংকটাপন্ন হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে গ্রিন এবং ব্ল্যাক ডাটা বুকের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হয়।

(2) গ্রিন ডাটা বুক (Green Data Book) : এটি একটি বৃহৎ পুস্তক বা তালিকা যেখানে অবলুপ্তির বিপদ থেকে মুক্ত জীব প্রজাতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে।

(3) ব্ল্যাক ডাটা বুক (Black Data Book) : এই পুস্তক বা তালিকায় বিপদের লক্ষণযুক্ত বিরল জীবপ্রজাতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে।

➢ প্রজাতির ভৌগোলিক বণ্টন, জন্ম, বৃদ্ধি, অভিযোজন, নিজস্ব আকার ও ধ্বংসের মাত্রার উপর ভিত্তি করে IUCN Red List-এ প্রজাতিকে 9টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (i) বিলুপ্ত (Extinct, EX) (ii) প্রাকৃতিক বন্য বাসস্থান থেকে বিলুপ্ত (Extinct in the wild, EW) (iii) অতি সংকটাপন্ন (Critically Endangered, CR) (iv) সংকটাপন্ন (Endangered, EN) (v) বিপন্ন (Vulnerable, VU) (vi) প্রায় বিপদাপন্ন (Near Threatened, NT) (vii) স্বল্প-জ্ঞাত (Least Concerned, LC) (viii) তথ্যের অভাব (Data Deficient, DD) (ix) অ-মূল্যায়িত (Not Evaluated, NE) ।

চিত্র 6.20 : হর্লিকুইন ব্যাং

(i) বিলুপ্ত প্রজাতি (Extinct Species / EX) : বিলুপ্ত প্রজাতি বলতে সেই উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিকে বোঝায় যারা প্রাকৃতিক ও বন্য পরিবেশ এবং মনুষ্য পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। যেমন—দক্ষিণ আমেরিকার হার্লিক্যুইন ব্যাং।

(ii) প্রাকৃতিক বন্য বাসস্থান থেকে বিলুপ্ত (Extinct in the Wild/EW) : এক্ষেত্রে প্রজাতি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়।

(iii) অতি সংকটাপন্ন (Critically Endangered Species/ CR) : শেষ দশকে (10 বছরে) এই শ্রেণির জীবপ্রজাতির 80 শতাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন—উদ্ভিদের মধ্যে কলস্‌পত্রী, গরান, সুন্দরী এবং প্রাণীদের মধ্যে ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডার, নীল তিমি, কস্তুরী মৃগ, এশিয়াটিক সিংহ ইত্যাদি।

(iv) সংকটাপন্ন প্রজাতি (Endengared Species/EN) : শেষ শতকে (10 বছরে) এই শ্রেণির জীবপ্রজাতির 70 শতাংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বা হারিয়ে গেছে। যেমন—একশৃঙ্গ গন্ডার, কস্তুরী মৃগ, সুন্দরী গাছ ইত্যাদি।

(v) বিপন্ন প্রজাতি (Vulnerable Species / VU) : শেষ দশকে (10 বছরে) এই শ্রেণির জীবপ্রজাতির 50 শতাংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এই প্রজাতিগুলি বিপদাপন্ন। যেমন—চড়াই, শকুন।

(vi) প্রায় বিপদাপন্ন প্রজাতি (Near Threatened Species / NT) : এই শ্রেণির জীবপ্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন এবং অবৈজ্ঞানিক মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

(vii) স্বল্প জ্ঞাত প্রজাতি (Least Concerned Species / LC) : এই প্রজাতির নির্দিষ্ট কোনো তথ্য না থাকলেও প্রজাতির প্রাচুর্যতা রয়েছে।

(viii) তথ্যের অভাব (Data Deficient, DD) : উপযুক্ত তথ্যের অভাবে IUCN কর্তৃপক্ষ কিছু জীবগোষ্ঠীর বা প্রজাতির মূল্যায়নের ঝুঁকি নিতে পারেনি। ফলে উক্ত প্রজাতির নাম Red list-এ নথিভুক্ত হয়নি।

Scanned with CamScanner

(ix) অ-মূল্যায়িত (Not Evaluated, NE) : উপরিউক্ত নির্দেশকের দ্বারা কিছু প্রজাতির মূল্যায়ন এখনও শুরু করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

➢ **ভারতের কিছু অতি সংকটাপন্ন, সংকটাপন্ন এবং বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির তালিকা (List of Critically Endangered and Vulnerable Animal Species of India):**

● **ভারতের অতি সংকটাপন্ন প্রাণীসমূহ (Cricitally Endangered Animals of India) :** ভারতে অতি বা ভয়ংকররূপে সংকটাপন্ন (Critically Endangered) প্রাণীর মধ্যে 10টি স্তন্যপায়ী, 15টি পাখি, 6টি সরীসৃপ, 1টি উভচর এবং 14টি মাছ রয়েছে [2015-এ IUCN-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে]। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজাতির তালিকা নীচে (সারণী 6.8) উল্লেখ করা হল—

সারণী 6.8 : ভারতের অতি সংকটাপন্ন প্রাণী প্রজাতিসমূহ

শ্রেণি	প্রজাতির নাম
স্তন্যপায়ী	পিগমী শূকর, কোন্ডানা ইঁদুর, বৃহৎ এলভিরা ইঁদুর, সুমাত্রার গন্ডার, নামডাফা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, হিমালয়ের নেকড়ে।
পাখি	বেঙ্গাল ফ্লোরিকান, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, সাইবেরিয়ান সারস, স্পুন-বিল্ড স্যান্ডপাইপার, শ্বেত পৃষ্ঠদেশযুক্ত শকুন, লাল মাথার শকুন, সাদা পেটযুক্ত বক, ভারতীয় শকুন, গোলাপি মাথার হাঁস।
সরীসৃপ	ঘড়িয়াল, হক্সবিল বড়ো কচ্ছপ, পৃষ্ঠে পাল্কযুক্ত বড়ো কচ্ছপ, বেঙ্গাল রুফ বড়ো কচ্ছপ।
উভচর	আন্নামালাইয়ের উড়ন্ত ব্যাং, কেরালা ইন্ডিয়ান ব্যাং, চার্লস ডারউইনস্ ব্যাং, টাইগার টোড বা ব্যাঙাচি।
মাছ	পুদুচেরীর হাঙর, গঙ্গার হাঙর, ছুরির ন্যায় দন্তযুক্ত করাত মাছ।
প্রবাল	ফায়ার প্রবাল।
মাকড়সা	রামেশ্বরম অর্ণামেন্টাল বা রামেশ্বরম প্যারাসুট মাকড়সা।

[Source : IUCN]

➢ **ভারতের সংকটাপন্ন প্রাণীসমূহ (Endangered Animals in India) :**

প্রাণী প্রজাতির মধ্যে 2টি মাছ, 1টি পাখি, 1টি সরীসৃপ এবং 44টি স্তন্যপায়ীর অবস্থান লক্ষণীয় (2015-এ -এর IUCN প্রদত্ত তথ্য অনুসারে)। নীচে (সারণী 6.9) এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতিগুলি উল্লেখ করা হল।

সারণী 6.9 : ভারতের সংকটাপন্ন প্রাণী প্রজাতিসমূহ

শ্রেণি	প্রজাতির নাম
মাছ	এশিয়ান অ্যারোওয়ানা, রেডলাইন টর্পেডো বার্থ
পাখি	নারকোন্ডাম হর্ণবিল।
সরীসৃপ	অসম রুফড্ বৃহৎ কচ্ছপ
স্তন্যপায়ী	এশিয়াটিক সিংহ, রয়েল বেঙ্গাল টাইগার, নীল তিমি, বারসিংহা, মেছো বিড়াল, গাঙ্গেয় ডলফিন, ভারতীয় হাতি, ভারতীয় বন্য গাধা, লায়ন টেইল্ড ম্যাকাও, নীলগিরি মার্টেন, মার্বেল্ড বিড়াল, নিকোবরের উড়ন্ত শেয়াল, নীলগিরি লেঙ্গুর, নীলগিরি টার, পাম বিড়াল, রেড পান্ডা, তুষার চিতা, শ্লোথ ভাল্লুক, সোয়াম্প হরিণ, টাকিন, তিব্বতীয় অ্যান্টিলোপ, বন্য জলজ মহিষ, বন্য ছাগল, চমরীগাই, সাদা পেটযুক্ত মাস্ক হরিণ, পশমযুক্ত উড়ন্ত কাঠবিড়ালী।

[Source : IUCN]

➢ **ভারতের বিপন্ন প্রাণীসমূহ (Vulnerable Animals of India) :**

প্রাণী প্রজাতির মধ্যে 5টি স্তন্যপায়ী এবং 1টি সরীসৃপ ও উভচরের অবস্থান লক্ষ করা যায় (2012-এ IUCN-এর তথ্য অনুসারে)। নীচে (সারণী 6.10) এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজাতির উল্লেখ করা হল—

Scanned with CamScanner

সারণী 6.10 : ভারতের বিপন্ন প্রাণী প্রজাতিসমূহ

শ্রেণি	প্রজাতির নাম
স্তন্যপায়ী	ক্লাউডেড লেপার্ড, ডাগং, ভারতীয় গন্ডার, গৌর বা ভারতীয় বাইসন, রাস্টি-স্পটেড বিড়াল।
সরীসৃপ ও উভচর	অলিভ বিড়াল, সামুদ্রিক বৃহৎ কচ্ছপ।

[Source : IUCN]

➢ **সংরক্ষণ তালিকাভুক্ত ভারতের কয়েকটি বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী (Some Vulnerable Mammals of India Included in Conservation List) :** 1650 সালের আগে প্রজাতির বিলুপ্তির সংখ্যা ছিল 1 থেকে 5 (প্রতি 10 বছরে)। বর্তমানে প্রজাতির বিলুপ্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, প্রতি 10 বছরে প্রায় 1500 এর-ও বেশি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রজাতি বিলুপ্তির সংখ্যা বহুলাংশে বেশি। IUCN (International Union for the Conservation of Nature) তাদের 'Red Data Book' পুস্তকে বর্তমানে প্রায় 600টি প্রজাতির নাম তালিকাভুক্ত করেছে। এই 'Red Data Book'-এ 132টি স্তন্যপায়ীর নাম রয়েছে যার মধ্যে 42টি ভারতীয় স্তন্যপায়ীর নাম তালিকভুক্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, বন্য গাধা, বুনো মোষ, সোনা বিড়াল, গন্ডার, কৃষ্ণসার মৃগ, কস্তুরীমৃগ, লজ্জাবতী বানর, কেশরী বানর, নীলগিরি হনুমান প্রভৃতি। এই সমস্ত বিপন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

1. সিংহ (Lion) : অতীতে ভারতের বিভিন্ন জঙ্গালে সিংহ বসবাস করত। চোরাশিকারীদের ফাঁদে সিংহের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায়। বর্তমানে একমাত্র গুজরাটের গির অঞ্চলে সিংহ বাস করে। 1985 সালে আদমসুমারিতে জানা যায় যে তৎকালীন সময়ে সিংহের সংখ্যা ছিল 239, তবে বর্তমানে বিভিন্ন বন্য আইন প্রণয়ন করে সিংহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

2. বাঘ (Tiger) : ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের অরণ্যে বাঘের বাস রয়েছে। ভারতীয় বাঘের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গাল টাইগার আকারে ও সৌন্দর্যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। মধ্যপ্রদেশে রেওয়া অরণ্যেও সাদা বাঘ রয়েছে। বর্তমানে ভারতে বাঘের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। একদিকে যেমন বন্যপ্রাণীদের প্রাকৃতিক বাসভূমি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি চোরাশিকারীদের উপদ্রবে বাঘের সংখ্যা দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে ব্যাঘ্রপ্রকল্প চালু করে এদের সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

3. বাইসন বা গৌর (Indian Bison or Gaur) : বাইসনের সংখ্যা সর্বাধিক উত্তর-পূর্ব ভারতে, তবে দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলেও বাইসনকে দেখতে পাওয়া যায়। ডুয়ার্স ও অসমের জঙ্গালেও প্রচুর বাইসন দেখা যায়। এরা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। চোরাশিকারীর ফাঁদে এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

4. গন্ডার (Rhinoceros) : পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সের জলদাপাড়া ও অসমের জঙ্গালে প্রচুর একশৃঙ্গাযুক্ত গন্ডার দেখা যায়। চোরাশিকারীর কবলে পড়ে ধীরে ধীরে গন্ডারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বর্তমানে ভারত সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে গন্ডার ও বিভিন্ন বন্যজন্তুর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

5. চিতা (Leopard) : চিতাবাঘ দুই প্রজাতির হয়—(i) শিকারী চিতা ও (ii) তুষার চিতা। ভারতবর্ষে এই দুই প্রকার চিতা আগে দেখা যেত। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এরা বেশি বসবাস করত। বর্তমানে চামড়ার লোভে চোরাশিকারীরা প্রচুর চিতাবাঘকে হত্যা করছে। ফলে ধীরে ধীরে চিতাবাঘের সংখ্যা কমে আসছে। উত্তরবঙ্গের চিতার অবস্থান প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রতিদিন যে হারে বনভূমিকে ধ্বংস করে বসবাসযোগ্যভূমি ও কৃষিভূমিতে রূপান্তর করা হচ্ছে, তাতে ধীরে ধীরে এই পরিবেশ থেকে চিতাগুলি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

6. বুনো মোষ (Wild Buffalo) : অতীতে ভারতের বিভিন্ন জঙ্গালে বুনো মোষ দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে অসমের মানস অভয়ারণ্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। বুনো মোষের মাংস ও চামড়ার লোভে চোরাশিকারীরা প্রচুর বুনো মোষকে মেরে ফেলছে। এখন এদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমছে।

7. হাতি (Elephant) : আফ্রিকার হাতির তুলনায় ভারতীয় হাতি অনেক বড়ো ও দীর্ঘাকার। ভারতীয় হাতি 10-12 ফুট পর্যন্ত উচু হয়। পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও কেরালার পেরিয়ার জঙ্গালে অধিক সংখ্যক হাতি লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন জাতীয় উদ্যানে হাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমান দশকে যে হারে প্রাকৃতিক বনভূমির আয়তন হ্রাস পাচ্ছে ও প্রাকৃতিক

Scanned with CamScanner

বনভূমির মধ্য দিয়ে রেল করিডোর, জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে, তার ফলে প্রায়শই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঘটছে। জঙ্গল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে পশ্চিমবঙ্গো রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর হাতির মৃত্যু ঘটে। (*এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।*)

8. বুনো গাধা (Wild Ass) : ভারতের গুজরাটের কচ্ছের রান অঞ্চলে একমাত্র বুনো গাধা দেখতে পাওয়া যায়। আগে এদের সংখ্যা অনেক ছিল তবে বর্তমানে এদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে 350-এ দাঁড়িয়েছে।

9. নীলগিরি থর (Nilgiri Thar) : এই ক্ষুদ্র বন্য প্রাণীটিকে একমাত্র নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এরা অন্যান্য বন্য মাংসাশী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। এদের গায়ের রং কালো ও বাদামি। নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা এদের হত্যা করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে এদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

10. নীলগিরির হনুমান (Langur of Nilgiri) : দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে এই প্রজাতিদের দেখা যায়। সাধারণত নীলগিরির হনুমানদের গায়ের রং কালো ও বাদামি এবং মাথার রং হলুদ। এই প্রজাতিরা একসাথে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। এরা জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের ফলমূল ও পাতা খেয়ে থাকে। এদের শরীর ও লেজ সমেত মোট দৈর্ঘ্য 160-170 সেমি। এই পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, এমনকি সুন্দর লোমের জন্য এই উপজাতির লোকজনেরা এদের হত্যাও করে। ফলে এই প্রজাতির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

11. হিমালয়ের কস্তুরীমৃগ (Himalayan Musk Deer) : বহুবছর আগে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে এই কস্তুরী মৃগ দেখা যেত। বর্তমানে কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড ও সিকিম এবং ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে এদের দেখা যায়। এরা হরিণ ও অ্যান্টিলোপের সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলে মনে হয়। চোরাশিকারীদের জন্য এদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাসমান। বর্তমানে এরা অতি বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।

12. থামিন হরিণ (Thamin Deer) : এদের বাসভূমি হল মণিপুর। থামিন হরিণ তাদের শরীরের অর্ধেকের বেশি অংশ জলে ডুবিয়ে জলজ উদ্ভিদ খেতে পছন্দ করে। একসময় মণিপুরের লোকটাক হ্রদে এই প্রজাতির হরিণকে দেখা যেত। এদের শিং-এ ভেষজগুণ থাকায় প্রচুর থামিন হরিণকে মেরে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে মণিপুরের লোকটাক হ্রদের দক্ষিণে কেউগুলি লামজা অভয়ারণ্যে সরকারিভাবে এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

13. কাশ্মীরি হাংলু বা বারশিঙ্গা (Kashmir Stag or Barashinga) : কাশ্মীরি হাংলু বা বারশিঙ্গা পূর্ব কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যেত। পুরুষ কাশ্মীরি বারশিঙ্গা দেখতে খুব সুন্দর। বর্তমানে কাশ্মীরের পার্বত্য উপত্যকায় এদের দেখা যায়। এখন দচিগ্রাম অভয়ারণ্যে এই প্রজাতিকে সংরক্ষণ করায় এদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

14. বামন হগ্ (Pigmy Hog) : পূর্বে নেপাল ও উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে বিশেষ করে অসম ও উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত। বর্তমানে উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা খাদ্যের প্রয়োজনে এই প্রজাতির প্রাণীকে হত্যা করার ফলে এদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এদের দেখতে ছোটোখাটো ও দৈর্ঘ্য 2 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

6.3.2 *জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রধান দুটি পদ্ধতি (Two Major Processes of Biodiversity Conservation) :*

জীব বৈচিত্র্যে সংরক্ষণের যে দুটি পদ্ধতি যথেষ্ট মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলি হল—ইনসিটু ও এক্সসিটু সংরক্ষণ। এই পদ্ধতিগুলি প্রধানত সংরক্ষিত অঞ্চল, প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র, জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে প্রয়োগ করা হয়। প্রবাহ চিত্র 6.21-এ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা হল।

➢ **ইনসিটু সংরক্ষণ (In-situ Conservation) :** যখন কোনো বিপন্ন, বিপদসংকুল ও বিরল প্রজাতির প্রাণীকুলকে তার নিজস্ব বাসস্থানে অর্থাৎ বসতি এলাকায় সংরক্ষণ করা হয়, তখন তাকে **ইনসিটু বা অনসিটু সংরক্ষণ** (Insitu or Onsitu Conservation) বলে। এই ধরনের উদ্ভিদ বা প্রাণীপ্রজাতিকে সংরক্ষিত এলাকা অথবা জাতীয় উদ্যান এবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। ভারতে এখন 733টি সংরক্ষিত এলাকা, 120টির বেশি জাতীয় উদ্যান, 575টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং 18টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বর্তমান।

Scanned with CamScanner

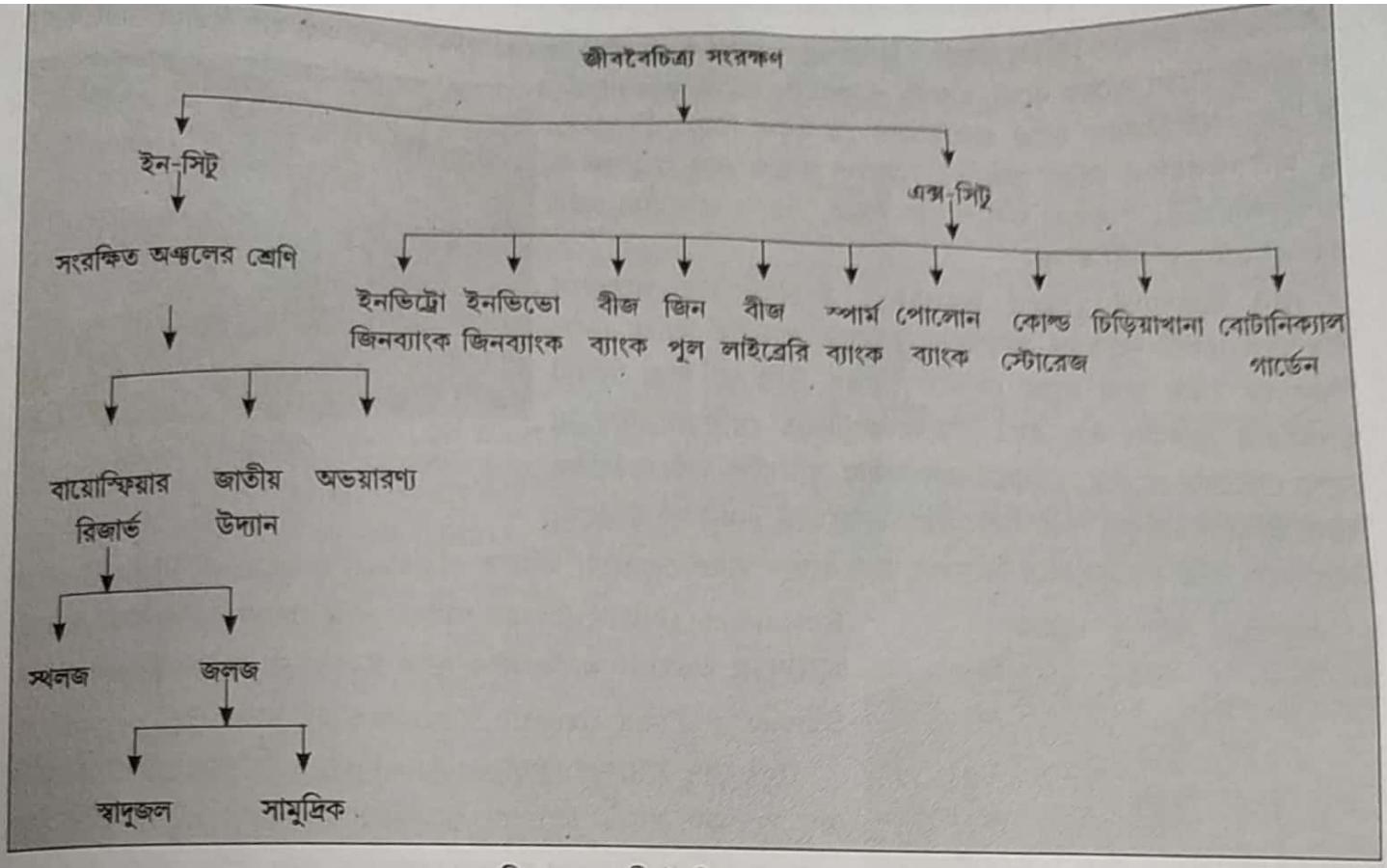

প্রবাহ চিত্র 6.21 : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ

➢ এক্স সিটু সংরক্ষণ (Ex-situ Conservation) :

প্রাকৃতিক জন্মস্থানের বাইরে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাসভূমি তৈরি করাকে এক্স সিটু সংরক্ষণ বলে। অন্যভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে কৃত্রিমভাবে জিনপুল ও জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ করাকে এক্স সিটু সংরক্ষণ বলে। এই পদ্ধতিতে অবলুপ্ত, সংকটাপন্ন ও ক্রমহ্রাসমান উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির জিনপুল সংরক্ষণ করা হয়। যেমন—চিড়িয়াখানা, বোটনিক্যাল গার্ডেন, বীজব্যাংক, রেণু সংরক্ষণ ও কলা পালন প্রভৃতি। এক্স সিটু সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিকে নীচে আলোচনা করা হল।

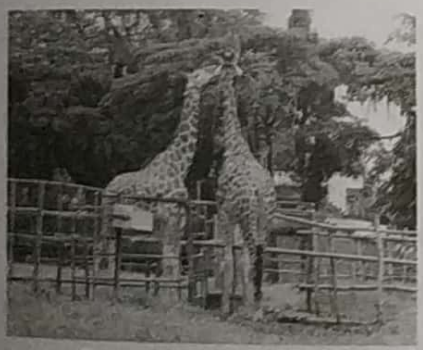

চিত্র 6.22 : চিড়িয়াখানা

(i) চিড়িয়াখানা (Zoo) : যখন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানে বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল, বিপন্ন ও অবলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয়, সেই স্থানকে চিড়িয়াখানা বলে। চিড়িয়াখানার মাধ্যমে উক্ত প্রজাতির স্থায়ী সংরক্ষণ ছাড়াও মানুষের দর্শন, প্রাণীদের পালন ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু বিরল প্রজাতির হরিণ ও বাইসন বহুকাল আগে ইউরোপে তাদের প্রাকৃতিক বাসভূমি হারিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানাতে তাদের সংরক্ষণের মাধ্যমে এই বিরল প্রজাতির সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে বর্তমানে 15টি খুব বড়ো (মোট আয়তন 2317·11 হেক্টর), 17টি মাঝারি এবং 32টি ছোটো চিড়িয়াখানার অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য (মোট আয়তন 4133 হেক্টর)। এছাড়া প্রায় 42টি অতি ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা রয়েছে, যার মোট আয়তন 27288 হেক্টর। কেন্দ্রীয় জু অথরিটি (Central Zoo Authority) প্রত্যেকটি চিড়িয়াখানাকে আর্থিক সাহায্য ও প্রজননের বিষয়ে অর্ন্তদেশীয় বিনিময় বা হস্তান্তর করতে উৎসাহ প্রদান করে।

(ii) বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical Garden) : এটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বিভিন্ন বিরল, অতিসংকটাপন্ন, অবলুপ্ত প্রায় ও ক্রমহ্রাসমান উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুর

Scanned with CamScanner

বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদকে সংরক্ষণ ও প্রজাতির প্রজনন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। এছাড়া ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে অনেক বড়ো, মাঝারি ও ছোটো বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়েছে। বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া যে সকল বিরল, বিপদগ্রস্ত ও অতি সংকটাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ করছে এবং সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে, তাদের নাম 'গ্রীন ডেটা বুক-এ' নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

চিত্র 6.23 : বোটানিক্যাল গার্ডেন

(iii) বীজব্যাংক (Seed Bank) : জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বীজব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বীজব্যাংক তৈরি করা হচ্ছে যেখানে বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। বীজব্যাংকগুলিতে রেফ্রিজারেটার বা কোল্ড স্টোরেজ রয়েছে, যেখানে তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে বিভিন্ন বিরল, অতিবিপদসঙ্কুল ও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন সব উদ্ভিদের বীজগুলিকে অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দিল্লিতে National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR)-এর অধীনে বীজ ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে। NBPGR বর্তমানে আর্ন্তজাতিক স্তরে FAO-এর অধীনে International Bureau of Plant Genetic Resource-এর সঙ্গে যুক্ত।

চিত্র 6.24 : বীজ ব্যাংক

(iv) রেণু সংরক্ষণ (Pollen Storage) : জীনগত বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে রেণু সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের রেণুকে 5 বছর পর্যন্ত সক্রিয় রাখা যায়।

(v) কলা পালন (Tissue Culture) : কলা ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিরল, বিপদসঙ্কুল ও হ্রাসমান প্রজাতির সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কলা ব্যাংকে বিভিন্ন প্রজাতির কলা (Tissue) সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

চিত্র 6.25 : রেণু সংরক্ষণ

(vi) মেরিস্টেম সংরক্ষণ (Meristem Preservation) : যে সকল উদ্ভিদ অযৌন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে তাদের স্টেম সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাইরাস আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করা যায়।

(vii) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) : বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের সুবাদে জীন সংশ্লেষ, জেনেটিক বস্তু বদল ও জীন রূপান্তর করে প্রজাতির সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। জৈবপ্রযুক্তির বিভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা ক্লোন সৃষ্টি করে সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(viii) জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ (Germplasm Conservation) : যে পদ্ধতিতে কোনো শারীরবৃত্তীয় বা অর্থনৈতিক গুণমানযুক্ত জীবের প্রোটোপ্লাজমযুক্ত উন্নত কোশকে নির্দিষ্ট সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ বলে। এই জার্মপ্লাজম থেকে একই বৈশিষ্ট্য বা ভিন্ন গুণসম্পন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সীড্ ব্যাংক ও জার্মপ্লাজম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। মূলত বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ করার জন্য সীড্ ব্যাংক অথবা জার্মপ্লাজম ব্যাংকে বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বীজ বা জিন সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে এই ধরনের সংরক্ষণাগারকে 'Gene Bank'ও বলা হয়।

চিত্র 6.26 : জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ

Scanned with CamScanner

■ **জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Conservation of Germplasm) :**

(i) পৃথিবীর জনসংখ্যা যে বিপুল হারে বাড়ছে, তাতে অধিক শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এর জন্য দরকার উচ্চ ফলনশীল বীজ অথবা উচ্চগুণসম্পন্ন শস্য প্রজাতির কোশ।

(ii) খাদ্যশস্য ছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন মাছ, মাংস, দুধ, ডিম। এর জন্য চাই উন্নত প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, সংকর প্রজাতির গোরু। আর জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব।

(iii) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে, বিপদসংকুল ও বিরল প্রজাতির জীবগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রতি বছর প্রায় 10 হাজারের ওপর প্রজাতি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বীজ বা জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের বিবর্তন ও সংরক্ষণ সম্ভব।

(iv) জার্মপ্লাজমের মাধ্যমে উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নতুন নতুন জিন মিশিয়ে নতুন প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

➢ **ইনভিভো জিনব্যাংক (In-Vivo Gene Bank) :** এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বীজ বা রেণু দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এমনকি সম্পূর্ণ উদ্ভিদকেও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের সংরক্ষণের পদ্ধতিকে ইনভিভো জিনব্যাংক বলে। এটি Plant Genetic Resource সংরক্ষণের একটি চিরাচরিত পদ্ধতি, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Seed Dormancy, Seed Borne Disease, Short-life of Seeds ইত্যাদি।

➢ **ইনভিট্রো জিনব্যাংক (In-Vitro Gene Bank) :** বিগত 40-50 বছর ধরে উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণের জন্য ক্রমবর্ধমানহারে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে বলে ইনভিট্রো সংরক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে অচিরাচরিত পদ্ধতির সাহায্যে উদ্ভিদের কোশ, কলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে 47টি দেশে জিন ব্যাংকের উপস্থিতি রয়েছে যেখানে শুধুমাত্র 12টি দেশ ইনভিট্রো জিনব্যাংকের মাধ্যমে উদ্ভিদ গোষ্ঠী বা উদ্ভিদ প্রজাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোশ ও কলা সংরক্ষণ করা হয়। যেমন—ইনভিট্রো বাসাভা জিনব্যাংক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় বর্তমানে উদ্ভিদের সর্বাধিক ইনভিট্রো সংরক্ষণ করা হয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে সর্বনিম্ন ইনভিট্রো জিনব্যাংকের উপস্থিতি দেখা যায়। এই সংরক্ষণ পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তা ছাড়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া ইনভিট্রো জিনব্যাংক তৈরি করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ কর্মী ও গবেষকেরও প্রয়োজন হয়।

চিত্র 6.27 : ইনভিট্রো জিনব্যাংক

6.3.3 *উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ (Others Precesses of Conservation of Plant, and Wildlife) :*

বিপন্ন, বিরল, বিপদাপন্ন উদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে 1968 সালে MAB (Man and Biosphere Programme) রূপায়ণের সিদ্ধান্ত সর্বস্তরে গ্রহণ করেন। UNESCO এবং MAB সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষ ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত একটি উচ্চ প্রশংসিত পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বন্য বাসভূমিকে বা মনুষ্যসৃষ্ট উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর বাসস্থানকে পৃথকভাবে চিহ্নিত ও নামকরণ করা হয়। যেমন—

(1) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserve), (2) অভয়ারণ্য (Sanctuary), (3) জাতীয় উদ্যান (National Park), (4) সংরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest), ও সুরক্ষিত বনভূমি (Protected Forest), (5) ব্যাঘ প্রকল্প (Tiger Project), (6) কুমির প্রকল্প (Crocodile Project), (7) মৃগ উদ্যান (Deer Park), (8) পাখিরালয় (Bird Sanctuary), (9) হস্তিপ্রকল্প (Elephant Project)।

সংরক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত বনভূমিতে চোরাশিকার এবং কাঠের চোরাকারবার

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। অভয়ারণ্য অথবা সংরক্ষিত বনভূমি অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর খাদ্য ও জলের নিয়মিত সরবরাহ যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এর সঙ্গে নতুন গাছ ও জলাশয় নির্মাণ করতে হবে। সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে পশু চিকিৎসকের নিয়মিত পরিদর্শন এবং নজরদারির ব্যবস্থা সক্রিয় করতে হবে। তা ছাড়া সংরক্ষিত বা সুরক্ষিত বনভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নতুন জনবসতি ও কলকারখানা তৈরি নিষিদ্ধ করা উচিত। এক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তন, রোগ, বংশবিস্তার ও ভারসাম্যের ওপর গবেষণা চালাতে হবে।

(1) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserve) :

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে বলা যায় 'Living Laboratories'। এটি এমন একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে বিপন্ন, বিরল ও বিপদাপন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে স্থলজ, জলজ ও বায়ুবীয় বাসস্থলকে একত্রিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ শব্দটি 1968 সালে MAB দ্বারা আয়োজিত সেমিনারে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সেমিনারে প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল 'The rational use and conservation of the resources of the biosphere'। এই সেমিনারে গৃহীত সুপারিশগুলি হল— (1) প্রত্যেকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদি বাসভূমি সংরক্ষণ এবং (2) বিপন্ন, বিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংরক্ষণ ও প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে 1969 সালে পৃথিবীব্যাপী উদ্ভিদ ও প্রাণীগোষ্ঠীর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে MAB -এর তত্ত্বাবধানে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ, অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান চিহ্নিত করা হয়। তবে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ'-এর সৃষ্টি নিয়ে বহু মতামত রয়েছে। বেশির ভাগ জীববিজ্ঞানী মনে করেন 1971 সালে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। 1976 সালে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' প্রথম শনাক্তকরণ করা হয়। MAB দ্বারা চিহ্নিত 1986 সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা ছিল 261টি, যা মূলত 70টি দেশে চিহ্নিত করা হয়। 2005 সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় 499 টি (110টি দেশ থেকে)। বর্তমানে ভারতবর্ষে মোট বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর সংখ্যা 18টি, যার মধ্যে 4টি MAB দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলি হল—(1) নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (2000), (2) মান্নান উপসাগরে সামুদ্রিক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (2001), (3) সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (2001), (4) নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (2004)।

বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংরক্ষণের জন্য যৌথভাবে UNESCO ও UNEP কাজ করছে। 1974 সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিসমূহ। পরবর্তীকালে 1981 সালে UNESCO বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ প্রকাশ করে। এর মূল বিষয়বস্তু ছিল—'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সুরক্ষিত এলাকাগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সংযোগ গঠন করে যেখানে গবেষণা, পরিবেশগত নিরীক্ষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ বাস্তুতান্ত্রিক ও জিনগত বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ সম্মিলিতভাবে সংরক্ষণের একটি সমন্বিত ধারণা গড়ে তোলে। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হিসেবে প্রতিনিধিস্বরূপ নির্বাচিত হয়ে থাকে।' ('Biosphere reserves form an international network of protected areas in which an intigrated concept of conservation is being developed, combining the preservation of ecological and genetic diversity with research, environmental monitoring, education and training. Biosphere Reserves are selected as representative example of the world's ecosystems'.) (সূত্র : UNESCO 1981 : MAB Information System : Biosphere Reserve, Compilation No. 2313P)

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের প্রধান 3টি উদ্দেশ্য হল—

(1) জীবগোষ্ঠীর সংরক্ষণ।

(2) 'মানুষ ও বায়োস্ফিয়ার পরিকল্পনা'-র অন্তর্গত প্রজাতির গবেষণা ও নিরীক্ষণ।

(3) পরিবেশের সংরক্ষণ ও মানব উন্নয়ন অর্থাৎ উক্ত অঞ্চল বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানব অর্থনীতির স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) রূপরেখা তৈরি করা।

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর প্রধান 3টি অঞ্চল থাকে। যথা—

(1) কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Core Area), (2) বাফার অঞ্চল (Buffer Zone), (3) প্রান্তবর্তী অঞ্চল (Transitional Zone)।

এই 3টি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নিরীক্ষণ কেন্দ্র বা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়, যেখানে বন্যকর্মী ও গবেষকরা

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন প্রজাতির বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রজাতির বংশবিস্তার, প্রজনন, অভিযোজন নিয়ে গবেষণা করেন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

➢ **বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বিভিন্ন অঞ্চল (Different Zones of Biosphere Reserve) :**

UNESCO এবং UNEP 1974 সালে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ'-এর 3 টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে। যেমন—

(1) সংরক্ষণমূলক ভূমিকা, (2) লজিস্টিক ভূমিকা ও (3) উন্নয়নমূলক ভূমিকা

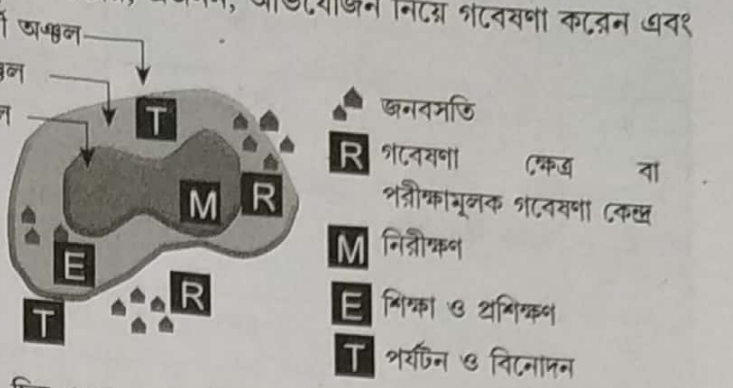

চিত্র 6.28 : বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর মডেল

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের কার্যকরী ধরন আলোচনা করা হল—

● **কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Core Area) :** প্রত্যেকটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের এক বা একাধিক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত কেন্দ্রীয় অঞ্চল থাকে যাকে সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করা হয়। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আকার বা আকৃতি উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের ওপর নির্ভর করে। অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে 'Nature Reserve of Wild Areas' অথবা 'জাতীয় উদ্যান' হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে মানুষের বসবাস সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। একমাত্র বনদপ্তরের কর্মী, প্রশিক্ষক ও গবেষকরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বাইরে থাকে বাফার জোন বা অঞ্চল যা একটি বা একাধিক প্রশাসনিক এককে বিভক্ত হতে পারে।

● **বাফার অঞ্চল (Buffer Zone) :** বাফার জোনে পর্যটক ও সাধারণ মানুষের প্রবেশ বনদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষ। এই অঞ্চল একাধিক প্রশাসনিক একক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়। পরিবেশগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পর্যটন ও আমোদপ্রমোদমূলক উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চল ব্যবহৃত হয়। কিছু কিছু বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বাফার অঞ্চল 'Experimental Research'-এর কাজে ব্যবহার করা হয়।

● **প্রান্তবর্তী অঞ্চল (Transitional Zone) :** বাফার অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী বা বাইরের অঞ্চলকে প্রান্তবর্তী অঞ্চল (Transitional Zone) বলা হয়। বিভিন্ন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর ক্ষেত্রে প্রান্তবর্তী অঞ্চলে জনবসতি ও শহরের উপস্থিতি দেখা যায়। আধুনিক যুগে উক্ত অঞ্চলে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক অবনমনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য অনেকাংশে নিম্নমুখী। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় সর্বোপরি পরিবেশ ও বন দপ্তরের দ্বারা উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের, সাধারণ জনগণ ও গবেষকদের প্রদান করা হয়। চিত্র 6.28-এ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর সরলীকৃত মডেল দেওয়া হল।

ভারতের 18টি রায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ-এর তালিকা নীচে (সারণী 6.11) উল্লেখ করা হল—

সারণী 6.11 : ভারতের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	স্থানের নাম	ভৌগোলিক সীমানা (বর্গকিমি)	শনাক্তকরণের সময়	অবস্থান
1.	নীলগিরি	5,520	1986	পশ্চিমঘাট পর্বতের (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা) ওয়াইনাদ, নাগারহোল,বন্দীপুর, মধুমালাই, সাইলেন্ট- ভ্যালি এবং সিরুভানী পাহাড়।
2.	নন্দাদেবী	5,860	1988	পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরাখন্ড রাজ্যের চামোলি, পিথোরাগড় এবং আলমোরা জেলার কিছু অংশবিশেষ।
3.	নোকরেক	820	1988	পূর্ব হিমালয়ের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের অংশবিশেষ।

Scanned with CamScanner